চতুর্থ অধ্যায়

চোখের সামনেই ঘটছে বিবর্তন!

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

ভুরিভুরি বই রয়েছে বাজারে বিবর্তনের উপরে, বিজ্ঞানীরা প্রতিদিনই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে আমাদের চারপাশের প্রকৃতি, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিবর্তনের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিবর্তন তত্ত্ব আজকে আমাদের শুধু প্রাণের বিকাশ, বিলুপ্তি এবং টিকে থাকার ব্যাপারটাই বুঝতে সাহায্য করছে না, আজকের এই জীবজগৎ কি করে ক্রমাগতভাবে বদলে যাচ্ছে এবং তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তার একটা পূর্ণাংগ ব্যাখ্যাও দিচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন বিবর্তনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে না দেখলে আজকের এই আধুনিক জীবনযাত্রা থেকে অবশ্য প্রয়োজনীয় অগ্রগতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনেকটুকুই বাদ দিয়ে দিতে হবে। আজকে বিবর্তন তত্ত্বকে বাদ দিলে - আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষ বা অন্যান্য জীবের ডিএনএ র গঠন বুঝে জটিল অসুখের চিকিৎসা বের করা এবং রোগ প্রতিষেধক ভ্যাকসিন তৈরির কাজ বাদ দিয়ে দিতে হবে, পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা, দূষণ রোধ, গ্লোবাল ওয়ারমিং সহ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হবে, উন্নত জাতের ফসল তৈরি করার কাজ বা কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে - বন্ধ করে দিতে হবে আরো হাজারটা গবেষণা ও আবিষ্কার যেগুলো লিখতে গেলে সত্যিকার অর্থেই প্রমাণ আকারের 'মহাভারত' হয়ে যাবে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে বিবর্তন তত্ত্বের গুরুত্ব আজকে এতখানিই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যন্ত এখন বিবর্তনীয় জীববিদ্যা, বিবর্তনীয় চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি নামে নতুন সব শাখারও সৃষ্টি করা হচেছ [১]।

> বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী টি. ডবঝানস্কি (T. Dobzhansky, ১৯০০-১৯৭৫) ঠিকই বলেছিলেন যে বিবর্তনের আলোয় বিচার না করলে জীববিজ্ঞানের কোন কিছুরই কোন অর্থ হয় না [২]।

গত শতাব্দীতেই বিবর্তনবাদকে জীববিজ্ঞানের মূল শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ডারউইন তার বিবর্তন তত্ত্ব প্রস্তাব করছিলেন প্রায় দেড়শো বছর আগে, তারপর থেকেই জেনেটিক্স, অনুজীববিদ্যা, জিনোমিক্সসহ জীববিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় যত অভাবনীয় আবিষ্কার হয়েছে তার সবই এক বাক্যে বিবর্তনবাদের পক্ষে রায় দিয়ে যাচ্ছে। লাখ লাখ ফসিলের মধ্যে এখন পর্যন্ত এমন একটাও ফসিল পাওয়া যায়নি যা কিনা প্রাণের বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে ক্ষুন্ন করে। কিন্তু তাতেই বা কি? ধর্মীয় কুসংস্কার, গোড়ামী, নোংরা রাজনৈতিক কারণে আজও কিন্তু বিজ্ঞানের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটিকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। আমেরিকাসহ সারা বিশ্বজুড়ে বিবর্তনবাদ বিরোধীরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবেই তাদের অপ-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে ডারউইনের এই তত্ত্ব যে কত বড় আঘাত হেনেছে তা বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দী জুড়ে রক্ষণশীলদের চালানো আমরণ সংগ্রামের নমুনা দেখলেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তাদের একটা খুব প্রিয় যুক্তি হচ্ছে বিবর্তন নাকি চোখে দেখা যায় না, কাজেই তা অবৈজ্ঞানিক! হ্যা, এটা ঠিক কথা যে, প্রাণী বা উদ্ভিদের উপর বিবর্তন

সাদারণতঃ ঘটে খুবই ধীরে, মোটামুটি লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায় এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে, যা হয়তো এক প্রজন্মের জীবদ্দশায় দেখে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞান তো শুধু যা চোখের সামনে দেখা যায় তাই নিয়ে কাজ করে না - যদি তাই করতো তাহলে তো ফসিলবিদ্যা, জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা, জৈব-ভূগোল কিংবা রসায়নবিদ্যার মত বিভিন্ন শাখাগুলোকে অনেক আগেই অবৈজ্ঞানিক বলে ধরে নিতে হত! পদার্থবিদ্যার কথাই ধরুন না, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি চোখে দেখা যায়, পৃথিবীটা যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে সেটাই বা কে চোখে দেখেছে? খালি চোখে দেখলে তো আসলেই মনে হয় সূর্যটা ঘুরে ঘুরে এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে, তাহলে কি প্রাচীনকালের মত আমরা তাই ভেবেই বসে থাকবো?

> কিন্তু তার চেয়েও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, আজকাল আমরা আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন উদ্ভিদ, কীট পতংগ, ভাইরাস এমনকি প্রানীরও বিবর্তন যেমন পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছি, তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই তা সরাসরি পর্যবেক্ষনও করতে পারছি।

প্রকৃতিতে যেমন নিত্য নতুন প্রজাতির উৎপত্তি হচ্ছে তেমনি উন্নত ধরণের ফসল উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীরা গবেষাণগারে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ তৈরি করছেন - শুধু একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে আমাদের চোখের সামনেই অহরহ ঘটে চলেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনসহ বিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার খেলা। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছিলাম পেপারড মথের বিবর্তন যেটা প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে ঘটেছিল আমাদের চোখের সামনেই। চলুন তাহলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী থেকে নেওয়া কিছু জলজ্যান্ত উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক, দেখা যাক আমাদের চোখের সামনে আসলেই বিবর্তন ঘটছে কিনা।

কেনো নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এইডস রোগের অপ্রতিরোধ্য এইচ আই ভি ভাইরাস?

এইডস রোগের জন্য দায়ী এইচ আই ভি (HIV, Human immunodeficiency Virus) ভাইরাস নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে আজ তোলপাড় চলছে। গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা কেন নাকানি চুবানি খাচ্ছেন এই ভাইরাসটির প্রতিষেধক বা ভ্যাক্সিন (Vaccine) বের করতে? শুনলে হয়তো অবাক হবেন, আর কিছুই নয় - এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, আনুবীক্ষণীক ভাইরাসগুলো আমাদের সাথে খেলছে ‘মিউটেশন’ এবং ‘প্রাকৃতিক নির্বাচনের’ মাধ্যমে ঘটানো বিবর্তনের এক ভয়াবহ লুকোচুরি খেলা। বিজ্ঞানীরা একে মোকাবিলা করার জন্য যেই না একটা ওষুধ প্রয়োগ করছেন সেই মাত্র তারা বিবর্তিত হয়ে নতুন রূপে দেখা দিচ্ছে, নতুন নতুন ওষুধগুলোকে আক্ষরিক অর্থেই যেন নাকে দঁড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। এই ‘লুকোচুরির’ ব্যাখ্যা তো বিবর্তনবাদ ছাড়া আর কোন কিছু দিয়েই দেওয়া সম্ভব নয়!

১৯৮১ সালে এইডস রোগ ধরা পড়ার পর এখন পর্যন্ত ২৫ মিলিয়ন বা আড়াই কোটি লোক মারা গেছে এই মারাত্মক রোগে, ২৫ বছর ধরে বিভিন্ন ওষুধের আবিষ্কারের পরও এর নিরাময়ের তেমন কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরং জাতিসংঘের এক সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪ কোটি

মানুষ ভুগছে আজ এইডস রোগে, শুধু ২০০৫ সালে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪৩-৬৬ লক্ষ মানুষ, আর মারা গেছে ২৮-৩৬ লক্ষ মানুষ [৩]। তাহলে চলুন আরেকটু ভালো করে খতিয়ে দেখা যাক কেনো এখনও বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসটাকে কোন মতেই বাগে আনতে পারছেন না ।

এই এইচ আই ভি ভাইরাসগুলোর গঠন কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীণ ধরণের, বংশগতির মূল উপাদান হিসেবে তারা আমাদের মত ডিএনএ (DNA, Deoxyribonucleic Acid) ব্যবহার করে না। তাদের এক কোষী দেহে ডিএনএ বলে কিছু নেই, আছে সেই প্রাচীণ আরএনএ (RNA, Ribonucleic Acid) - এই আরএনএ

চিত্র : ৪.১ : মানুষের কোষের ভিতরের ক্রোমসম, ডি এন এর (DNA) এবং জিনের গঠন, ভাইরাসের এক কোষী দেহে এই ডি এন এ নেই, তার বদলে আছে আর এন এঃ (সৌজন্যঃ http://www.okstate.edu/artsci/zoology/ravdb/files/Chrom-dna.jpg)

এর মাধ্যমেই তারা পরবর্তী প্রজন্মে তাদের জিন ছড়িয়ে দেয়। আর গোল বাঁধলো সেখানেই - ডিএনএ নেই বলে তারা নিজে নিজে স্বাধীনভাবে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না! বংশবৃদ্ধি করার জন্য ডিএনএ -ওয়ালা কোন উপযুক্ত পোষকের (host) দেহ কোষের ভিতরে ঢুকে পড়া ছাড়া আর উপায় কি? এক্ষেত্রে এইচ আই ভি ভাইরাসগুলো পোষক হিসেবে মানুষের দেহের কোষকে ব্যবহার করে (চিত্র ৪.১)। দেহকোষে একবার ঢুকে পরার পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে লক্ষ লক্ষ কপি তৈরি করার মাধ্যমে নিজের বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে দেয়। মানুষের কোষে বিশেষ কিছু প্রোটিন আছে যাদেরকে বলা হয় গ্রাহক (Receptor, যেমন ধরুন, CD4, CCR5 ইত্যাদি); - এদের সাথে নিজেকে জুড়ে দিয়েই তারা কোষের ভিতর ঢুকে পরে। তারপর বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় সে মানুষের কোষের ডিএনএ-এর উপর ভর করে তার ভিতরেই আরএনএ-এর কপি তৈরি করে ফেলে।

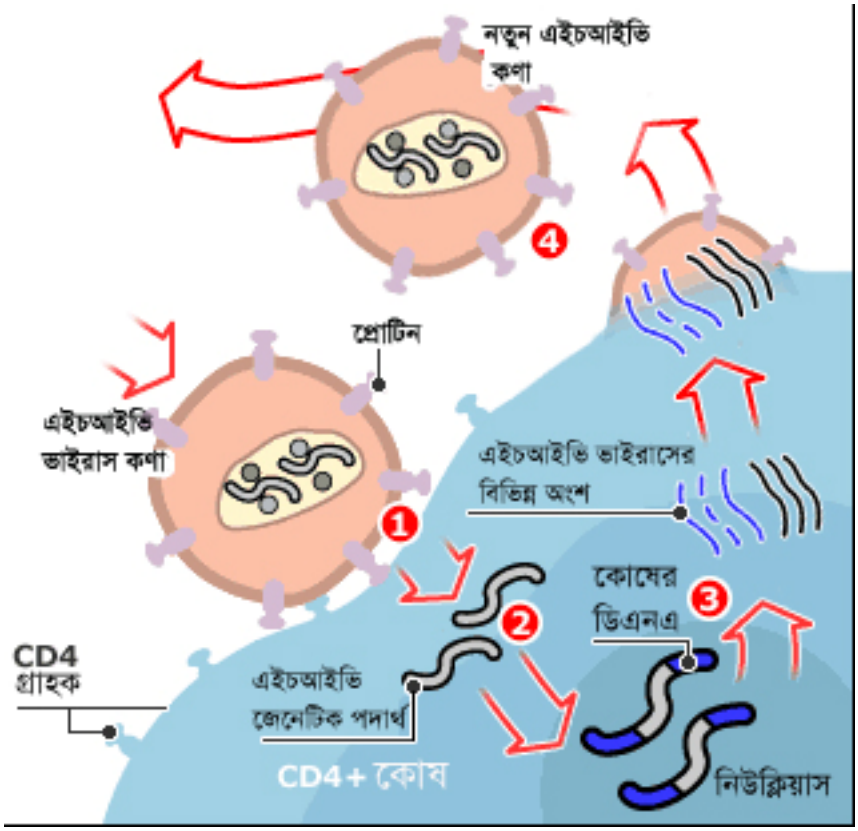

চিত্র : ৪.২: মানুষের কোষের (নীল অংশ) ভিতর এইচ আই ভি ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপ
(সৌজন্যঃ http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4434806.stm)

সেখান থেকেই ভাইরাসটির অসংখ্য কপি তৈরি হয়ে মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পরে এবং ধীরে ধীরে তার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে (immune system) ধ্বংস করে দিতে থাকে। আচ্ছা, এ ভাবেই না হয় ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করে, তাতে অসুবিধাটা কোথায়? এর সাথে তাকে প্রতিরোধ করার বা বিবর্তনেরই বা কি সম্পর্ক আছে?

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি, কোন জীবের উপর প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করতে হলে তার নিজস্ব জনপুঞ্জের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রকারণ (Variation) থাকতে হয়। জীবন সংগ্রামে যে সব প্রকারণ জীবকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে বেশী সুবিধা করে দেয় সেই সব জিনের অধিকারী জীবগুলোই বড় হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকে। আর অন্যদিকে যারা পরিবেশের সাথে কম খাপ খাওয়াতে পারে তারা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। এটাই সংক্ষেপে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মুল কথা। আবার অন্যদিকে, জিনের মধ্যে বিভিন্ন সময় আকস্মিক কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে যার ফলশ্রুতিতে অনেক সময় ডি এন এর গঠন বা সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটে যায় - আর একেই বলা হয় পরিব্যক্তি (mutation)। এই মিউটেশন কিন্তু প্রাণীর প্রয়োজনে ঘটে না, ঘটে এক্কেবারেই বিক্ষপ্ত এবং এলোমেলোভাবে। অঙ্ক কষার সময় কখন আনমনা হয়ে একটা ভুল করে ফেলবেন সেটা যেমন আগে থেকে বলা যায় না তেমনি বংশবৃদ্ধি করার করার সময় আপনার জিনের কোন অংশটার কপি করতে ভুল হয়ে যাবে সেটাও বলার কোন উপায় নেই। পরিবেশ, প্রাণীর কোষের গঠন ইত্যাদির উপর এটা নির্ভর করলেও করতে পারে। কিন্তু এই মিউটেশনের

ফলে যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি হয় তা দিয়ে যদি কোন জীব বেঁচে থাকার জন্য বাড়তি কোন সুবিধা পায়, তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই সেগুলো টিকে যায়। এখন ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির জন্য এক ধরনের বিশেষ এনজাইমের প্রয়োজন হয়, যেটা মানুষের শরীরে থাকে না, শুধুমাত্র ভাইরাসের কোষেই তা খুঁজে পাওয়া যায়। রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস (Reverse Transcriptase) [8] নামের এই এনজাইমটি খুবই দুর্বল ধরণের প্রাচীন এক মেকানিজমে তৈরি, আর সে কারণেই দেখা যায় বংশবৃদ্ধির সময় সে জেনেটিক কোডগুলোকে সব সময় ঠিক মত প্রতিলিপি তৈরী করতে পারছে না। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের ভাইরাসগুলোর মধ্যে অনবরতভাবে অসংখ্য মিউটেশন (Mutation) ঘটতে থাকে। আর তাই দেখা যায় যে, প্রতি নতুন প্রজন্মেই অসংখ্য রকমের নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভাইরাসের উৎপত্তি হচ্ছে, অর্থাৎ মিউটেশনের কারণেই তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন প্রকারণের। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের দেহের ভিতরে ভাইরাস যে শুধু অত্যন্ত দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করে তাই ই নয়, তাদের মধ্যে এই মিউটেশনের কারনেই প্রকারণের হারও থাকে অত্যন্ত বেশি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই এইচ.আই.ভি ভাইরাসের মধ্যে পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটতে থাকে অত্যন্ত দ্রুত হারে, আর তারই ফলশ্রুতিতে মানুষের দেহে তারা খেলতে থাকে অদম্য এক ভয়াবহ বিবর্তনের খেলা। বিজ্ঞানীরা অতীতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এইচ.আই.ভি প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন এবং এখনও নতুন নতুন ওষুধ তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যেমন ধরুন, এক ধরণের ওষুধ দিয়ে তারা চেষ্টা করেছেন ভাইরাসটির রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেসের কাজে বাঁধা দিতে, যাতে তারা মানুষের কোষের ডিএনএ-এর ভিতরে ঢুকতে না পারে। আবার অন্য আরেক ধরণের ওষুধ তৈরি করা হয়েছে যাতে করে ভাইরাসগুলো মানুষের দেহের কোষের গ্রাহকের সাথে জুড়তেই না পারে। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা নয়, এখানে আরেকটু গোলমেলে ব্যাপার আছে! এই ওষুধগুলো দিয়ে আপাতভাবে এইডসের রোগীর দেহে ভাইরাসের প্রকোপ অল্প কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করা গেলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এদের কোনটা দিয়েই কোন কাজ হচ্ছে না। কয়েক মাস বা বছর ফুরোলেই এইচআইভি ভাইরাসগুলো আবার প্রবল বিক্রমে রোগীর দেহে ফিরে আসে। চলুন তাহলে দেখা যাক কেনো এই ওষুধগুলো বারবার ব্যর্থ হচ্ছে।

ঘটনাটা আসলে আর কিছুই নয়। আমরা আগেই দেখেছি, ভাইরাস খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং খুব কম সময়ে ভাইরাসগুলোর মধ্যে খুব বেশী হারে মিউটেশন হয় বলে এদের মধ্যে হাজারো রকমের বৈশিষ্ট্যের হের ফের দেখা যায়। তার ফলে রোগীর দেহে কোন একটা বিশেষ ওষুধ প্রয়োগ করার পর বেশীরভাগ ভাইরাস মরে গেলেও, এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের ভাইরাস সবসময়েই থেকে যায় যাদের উপর ওই ওষুধটা কোন কাজ করতে পারে না। তারাই বেঁচে থাকে এবং কিছুদিনের মধ্যে আবারো বংশবৃদ্ধি করে সারা দেহে ছড়িয়ে পরে। তবে এবার যে ভাইরাসগুলো বেঁচে থাকলো এবং তাদের থেকে যে এক নতুন ভাইরাসের প্রজন্ম উৎপত্তি হলো তাদের সবার মধ্যেই ওষুধটি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তৈরি হয়ে গেছে। তার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ওষুধটি সম্পুর্নভাবে অকেজো হয়ে যায় ওই রোগীর শরীরের রোগ নিরাময়ে।

> আসলে এখানে আমরা খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছি ডারউনের বলে যাওয়া সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনের এক মোক্ষম উদাহরন। পার্থক্য এতটুকুই যে এই বিবর্তনগুলো ঘটছে আমাদের চোখের সামনে, অতি দ্রুত, আনুবীক্ষনীকভাবে মানুষের শরীরের ভিতর; আর ডারউইন তাদেরকে দেখেছিলেন প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশে বা দক্ষিন আমেরিকার

গ্যালাপ্যগাস দ্বীপপুঞ্জে।

একেকটা রোগীর দেহ যেনো ডারউইনের সেই গ্যালাপ্যগাস দ্বীপপুঞ্জের একেকটা দ্বীপ - ফিঞ্চ পাখিগুলো যেমন তাদের নিজস্ব দ্বীপের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তিত হয়েছিলো, তেমনিভাবে ভাইরাসগুলোও প্রত্যেকটা মানব শরীরের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন পরিবেশে অনবরত বদলে যাচ্ছে - পোষকের শরীরের বিশেষ সব বৈশিষ্ট্য, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা, রোগের চিকিৎসার ধরণ, ওষুধের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তন ঘটে চলেছে এই ভয়াবহ ভাইরাসগুলোর! কখন, কিভাবে, কোন আকস্মিক মিউটেশনের ফলশ্রুতিতে ভাইরাসগুলোর কিরকম বিবর্তন ঘটবে তা আগে থেকে বলা মুশকিল। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, প্রত্যেক এইডসের রোগীর পরিস্থিতি এবং তার দেহের ভিতরে এইচআইভি ভাইরাসের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করে তারপর বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ধরনের ওষুধের আবিষ্কার করতে হবে, তবেই না এ রোগ সারানো যাবে! এখন তাহলে একবার ভেবে দেখুন তো, যে বিজ্ঞানীরা আজকে এইডস রোগের ভাইরাসের ওষুধ বের করার কাজে নিযুক্ত আছেন তাদের এই পরিস্থিতিতে নিজের মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া আর কিইবা করার থাকতে পারে! ওনারা কি বছরের পর বছর ধরে প্রত্যকটা রোগীকে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করে প্রত্যেকের জন্য নতুন নতুন ওষুধ বানাবেন? এই জটিল সমস্যাটা সমাধানের জন্য চিকিৎসাবিদ এবং বিজ্ঞানীরা এখন দেখছেন শুধু একটি মাত্র ভ্যাক্সিন ব্যবহার না করে, অনেকগুলো ভ্যাক্সিনের ককটেল ব্যবহার করলে ঘটনা কি দাঁড়ায়; কয়েক বছর ধরে এ ধরনের ওষুধের প্রয়োগে এইডসের চিকিৎসার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে। এ যেনো অন্ধের তীর ছোঁড়ার মত, কখন কোন্ তীরটা নিশানাকে ভেদ করবে, আদৌ করবে কিনা তা আগে থেকে নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই। বিজ্ঞানীরা আজকে মানুষের দেহে এইচ.আইভি ভাইরাসের এই দ্রুত বিবর্তনের প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন ধরণের ওষুধের প্রয়োগে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হয় তা আরও ভালো করে বোঝার চেষ্টা করছেন।

> বিবর্তনবাদকে গভীরভাবে বোঝা এবং তার যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া এই মারাত্মক এইডস রোগের চিকিৎসা কি করে সম্ভব, বলুন তো? আজকে বিবর্তনবাদ বিরোধীরা যদি এই ওষুধ তৈরির কাজে নিয়োজিত হন তাহলে কোটি কোটি এইডসের রোগীর কপালে কি আছে তা তো আর বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না।

আজকে ‘বার্ড ফ্লু’ নিয়ে যে বিশ্বজোড়া মহামারীর আশঙ্কা করা হচ্ছে তার পিছনেও রয়েছে একই কারণ। এই বার্ড ফ্লুর ভাইরাসটিও খুব দ্রুত নিজেকে বদলে ফেলতে সক্ষম। আগে তারা শুধুমাত্র মুরগী বা পাখির মধ্যে রোগটির বিস্তার ঘটাতে পারতো, কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে যে এক ধরনের মিউটেশনের ফলে তারা ইদানীং পাখি থেকে মানুষের দেহেও রোগ বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে। এখন পর্যন্ত থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তুরষ্কসহ বেশ কয়েকটি দেশেই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছু মানুষ মারা গেছে। বিজ্ঞানীরা ভয় পাচ্ছেন যে মিউটেশনের ফলে যদি এদের মধ্যে মানুষ থেকে মানুষের দেহে সরাসরি রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায় তাহলে তো আর উপায়ই নেই, বিশ্বজোড়া এক ভয়াবহ মহামারী ছড়িয়ে পড়তে পারে যে কোন মুহূর্তে। আবার এ রোগের ওষুধ আগে থেকে তৈরি করে অনেকদিন রেখে দেওয়া যায় না, তাই মহামারী শুরু হওয়ার পর এই রোগের ভ্যাক্সিন তৈরি করতে লেগে যাবে প্রায় ৮ মাস,

ততদিনে হয়তো ভাইরাসগুলো বিবর্তিত হয়ে এমন একটা রূপ ধারণ করবে যে ওই ওষুধে আর কোন কাজই হবে না [৫]। । ২০০৫ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী এখন আমরা জানতে পারছি যে, ১৯১৮ সালের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারীতে যে দুই কোটি লোক মারা গিয়েছিলো তার কারণ ছিলো এই একই ভাইরাস। আকস্মিক এক মিউটেশনের ফলেই তারা হঠাৎ করে পাখির বদলে মানুষের দেহে রোগ বিস্তার করতে শুরু করে দেয় - যার ফলাফল হয়েছিলো ভয়াবহ । আজকে এই মারাত্মক জীবানুগুলোর বিবর্তনের ধারাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ভ্যাক্সিন তৈরি করতে পারার উপরই নির্ভর করছে বিশ্বজোড়া মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার এক মাত্র উপায়।

কেনো ডি ডি টি দিয়ে আর ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না?

আমাদের মত দেশগুলোতে তো ম্যালেরিয়া কোন নতুন বিষয় নয়। আমরা সেই ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি যে এ্যানোফিলিস নামের এক ধরণের মশার মাধ্যমেই এই ম্যালেরিয়া ছড়ায়। এই রোগের জীবাণুটা এক ধরণের পরজীবী প্রটোজোয়া (protozoa) যা রোগীর রক্তের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। ম্যালেরিয়া রোগীকে যখন এই মশা কাঁমড়ায় তখন তার মাধ্যমেই জীবাণুটা ছড়িয়ে পড়ে আবার আরেকজনের শরীরে। মশার দৌরত্ব কমাতে পারলেই যেহেতু এই রোগের বিস্তার থামানো সম্ভব তাই অনেক সময়ই ম্যালেরিয়া আক্রান্ত জায়গাগুলোতে কীটনাশক ডিডিটি পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ডিডিটি হচ্ছে এক ধরণের মারাত্মক স্নায়বিক বিষ, মশার ঘাঁটিগুলোতে প্রথমবারের মত ডিডিটি ছড়ানোর সাথে সাথে মশার সংখ্যা এবং সেই সাথে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও আশাতীতভাবে কমে যায়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কয়েক দশক আগে ভারত, বাংলাদেশসহ আমাদের এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়ে

চিত্র : ৪.৩:পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিস্তার। সৌজন্যঃ (প্যান আফ্রিকান ম্যালেরিয়া কনফারেন্স-২০০৫) http://www.mim.su.se/conference2005/eng/registration.html

আনা গেলেও এখন আবার নতুন করে তা ফিরে আসতে শুরু করেছে। ষাটের দশকে বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা কমিয়ে ৭৫ মিলিয়নে নামিয়ে আনা হয়েছিলো, অথচ এখন তা বেড়ে আবার ৩০০-৫০০ মিলিয়নে দাড়িয়েছে। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কেনো আবার প্রতি বছর প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে এই মারাত্মক রোগে? কেনো আবার নতুন করে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ দেখা দিতে শুরু করেছে বিশ্বজুড়ে? আর কিছুই নয়, এখানেও আমরা দেখছি সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের খেলা! যেমন ধরুণ, চল্লিশের দশকের দিকে ভারতে প্রথমবারের মত ব্যাপকভাবে ডিডিটি ব্যবহার করার পর প্রায় ১০-১২ বছর ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ এক্কেবারেই কমে গিয়েছিলো। তারপর কি হল? তারপর এক দশক বাদে দেখা গেলো, এতে আর কাজ হচ্ছে না, ডিডিটি ছড়ানোর সাথে সাথে, কয়েক মাসের মধ্যেই ডিডিটি প্রতিরোধক মশার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে অকল্পনীয়ভাবে। এখন অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, ডিডিটি ছড়ানোর সাথে সাথেই ডিডিটি প্রতিরোধক মশার পাল তৈরি হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালের দিকে প্রথমবারের মত ভারতে এই ডিডিটি প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মশা দেখতে পাওয়া গেলো। কিভাবে তাহলে উৎপত্তি হল এই ডিডিটি প্রতিরোধক মশার? সেই একই নিয়মে, বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথ ধরেই। সব জীবের মতই মশার মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য এবং প্রকারণ রয়েছে। সাধারণ অবস্থায় মশকপুঞ্জের মধ্যে ডিডিটি প্রতিরোধক মশা সংখ্যায় খুব কম থাকে, কোন একধরণের মিউটেশন থেকেই হয়তো এক সময় এই প্রকারনটির উৎপত্তি হয়েছিলো। সাধারন অবস্থায় ডিডিটি প্রতিরোধে অক্ষম অংশটিই প্রকৃতিতে বেশী যোগ্য হিসেবে পরিগনিত হয়, তাই তাদের সংখ্যাও থাকে অনেক বেশী। ডিডিটি ব্যবহার করার সাথে সাথেই এই অংশটি মরে যায় কিন্তু বেঁচে থাকে শুধু সেই সংখ্যালঘু মশাগুলো যাদের মধ্যে ডিডিটি প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে। আর তার ফলে যা হবার তাই হয় - গুটিকয়েক এধরণের মশাগুলোই শুধু প্রাণে বেঁচে যায় যাদের জিনের মধ্যে রয়েছে ডিডিটি প্রতিরোধক ক্ষমতা। এরাই শুধু বংশ বৃদ্ধি করে পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করে এবং সংখ্যায় ফুলে ফেপে উঠতে থাকে। বেশ কিছু সময় পর স্বভাবতই দেখা যায় যে, মশার নতুন জনপুঞ্জের বেশীরভাগের মধ্যেই ডিডিটি প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে এবং যতই ডিডিটি ছড়ানো হোক না কেনো তাতে আর কোন কাজ হচ্ছে না।

একই রকম উদাহরণ দেখা যায় জমিতে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও। বারবার একই ওষুধ জমিতে দিতে থাকলে বেশীরভাগ দূর্বল পোকাগুলো মরে যায় কিন্তু কীটনাশকের ক্রিয়া প্রতিরোধে সক্ষম কিছু শক্তিশালী পোকা-মাকড় রয়ে যায় বংশবৃদ্ধি করার জন্য। ব্যাকটেরিয়ার মত জমির এই পোকাগুলোও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। অন্যদিকে ওষুধের কোম্পানীগুলোও দিন দিন আরও কড়া ওষুধ বের করতে থাকে এদেরকে দমন করার জন্য। এর ফলে একসময় দেখা যায় যে, জমিতে খুব বেশী কড়া ওষুধ প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন কাজই হচ্ছে না। আর অন্যদিকে যত তাড়াতাড়ি আমরা আরও জোড়ালো কীটনাশক ব্যবহার করি না কেন দেখা যায় তারা খুব কম সময়ের মধ্যেই বিবর্তিত হয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে ফেলছে। একটা মজার উদাহরণ দেওয়া যাক এখানে। নিউ ইয়র্কে প্রথমবারের মত যখন আলুর মধ্যে একধরনের গুবড়েপোকা ***কোলারাডো পটেটো বিটেল*** কে (Leptinotarsa septemlineata) মারার জন্য ডিডিটি ব্যবহার করা হয় তখন পোকাগুলোর লেগেছিলো ৭ বছর এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে। তারপর তাদেরকে দমন করার জন্য আরও শক্তিশালী azinphosmethyl যখন জমিতে ছড়ানো হল তখন তারা একে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেললো পাঁচ বছরে। এর পরে আরও শক্তিশালী carbofuran-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে সময় লেগেছিলো দুই বছর, আর সম্প্রতি অত্যন্ত কড়া কীটনাশক ওষুধ pyrethroids এর বিরুদ্ধে লেগেছে মাত্র এক বছর।

> এভাবে দিনের পর দিন শক্তিশালী কীটনাশক তৈরি করে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের এবং পরিবেশের কি পরিমান ক্ষতি করে চলেছি তা বোধ হয় ভেবে দেখার সময় হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই পোকা মাকড়, ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রকৃতিতে যেন রাজার হালে রাজত্ব করেছে, কোন ধরনের প্রতিরোধের শিকার হয়নি, তাই তাদের বিবর্তন ঘটেছিলো অন্য নিয়মে; প্রকৃতির খেয়াল খুশী মত। এখন গত অর্ধ শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ এবং কীটনাশকের সামনে টিকে থাকার দায়ে তারা আমাদের চোখের সামনেই প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম কারনে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত অসুখ সারানোর জন্য আমাদের প্রজন্ম অ্যান্টিবায়োটিককে একধরণের অপ্রতিরোধ্য অস্ত্র হিসেবেই ধরে নিয়েছিলো, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে তা আজকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা একটু ঝালিয়ে নিলে কিন্তু মন্দ হয় না। যথেচ্ছ ওষুধের ব্যবহারের পরিনতি কি হতে পারে তার এক মোক্ষম উদাহরণ হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে ঘটা এই ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন।

ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন, অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অপ্রতিরোধ্য ‘সুপার বাগ’

একজন ভাল ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার সময় রোগীকে পই পই করে বলে দেন ওষুধের সবকটি ডোজ যেনো সে শেষ করে এবং সতর্ক করে দেন তিন চার দিন পর একটু ভালো লাগলেই ওষুধটা খাওয়া যেনো ছেড়ে না দেয়। তিন চার দিনের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক শরীরের ভিতরের বেশীরভাগ ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে বলেই আমরা এত তাড়াতাড়ি সুস্থ বোধ করতে থাকি। এখন যদি হঠাৎ করে কেউ ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী এবং অ্যন্টিবায়োটিকের প্রতি অনেক বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বাকী ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের শরীরের ভিতরে রয়ে যাবে। এরাই তারপর বংশবৃদ্ধি করবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের ব্যাকটেরিয়ায় তাদের জিনই প্রবাহিত হবে (ব্যাকটেরিয়া কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করে)। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যাবে যে সেই রোগী আবার নতুন করে অনেক বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং এইবার আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ওষুধেও আর কাজ হচ্ছে না। প্রথমবার সবটুকু ওষুধ খেলে হয়ত সবগুলো ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলা সম্ভব হত, এখন হঠাৎ করে ওষুধটা খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার ফলে শুধুমাত্র ওষুধ প্রতিরোধকারী শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়াগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা হলো।

একই পরিণতি লক্ষ্য করা যায় যখন ফ্লু বা ঠান্ডা লাগলে আমরা ডাক্তারকে *টেট্রাসাইক্লোন* জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য জোড়াজুড়ি করতে থাকি। ইনফ্লুয়েনজা বা ঠান্ডার কারণ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া নয়; আর অ্যান্টিবায়োটিক শুধুমাত্র ব্যাকেটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এর কোন ভুমিকাই নেই। ফ্লু বা ঠান্ডার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক তো কোন কাজে লাগেই না, বরং আমাদের শরীরের ভিতরের দুর্বল ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলে শক্তিশালী কিছু ব্যাকটেরিয়াকে জিইয়ে রাখতে সহায়তা করে। তারপর ক্রমশঃ অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি অনেক বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এই

ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের শরীরে বংশবৃদ্ধি করে এবং ভবিষ্যতে অসুস্থ হলে আরও কড়া অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া কোন কাজ হয় না। বাংলাদেশের অনেক ডাক্তারই যে কোন অসুখের চিকিৎসায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে অ্যান্টিবায়োটিক এবং একাধিক ওষুধ দিয়ে থাকেন। যেনো ভাবটা হচ্ছে, একটা না একটা ওষুধ তো কাজ করবেই। কিন্তু এর ফলে রোগীর শরীরে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ভবিষ্যতে রোগ সারানোর জন্য অনেক কড়া ওষুধের প্রয়োজন হয়।

এতো গেলো একটা দিক, এরই আরেকটা ভয়াবহ দিক নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজকাল বেশ দুশ্চিন্তায়ই পড়তে শুরু করছেন বলেই মনে হয়। আপনারা সুপারম্যান, সুপার গার্লের সিনেমা দেখছেন, কিন্তু কখনও কি সুপার বাগ বা সুপার ব্যাকটেরিয়ার নাম শুনেছেন? গত অর্ধ শতাব্দী ধরে অ্যন্টিবায়োটিকের ব্যাপক ব্যবহার যেমন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে তেমনিভাবে তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে আজকে দেখা দিচ্ছে 'সুপার বাগ'। এমন কিছু ব্যাকটেরিয়ার উৎপত্তি হয়েছে যাদের উপর আজকের সবচেয়ে কড়া অ্যান্টিবায়োটিকটাও আর কাজ করছে না। আমরা যত শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করছি, ততই পাল্লা দিয়ে তারা বিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি ঘটে অত্যন্ত দ্রুত, তাদের মিউটেশনের হারও অত্যাধিক আর তার ফলে তাদের মধ্যে বিবর্তন ঘটতে থাকে অকল্পনীয়ভাবে দ্রুত গতিতে। মানুষের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় কত তাড়াতাড়ি ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন ঘটছে। শিকাগো ইউনিভারসিটির প্রফেসর রবার্ট ডম একবার বলেছিলেন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যে বিবর্তন ঘটতে লাগে ২০ মিনিট মানুষ প্রজাতিতে সেই বিবর্তন ঘটতে লাগে ২০ বছর [৬]।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য মিউটেশনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে তারা আজকে এমন অবস্থায় পৌছেছে যে, তারা সব ধরনের ওষুধই প্রতিরোধ করে টিকে থাকতে পারে। জানা গেছে, Staphylococcus aureus নামের ব্যাকটেরিয়াটি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক Vancomycin এর বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। ডিসকভারি পত্রিকার বিশেষ এক প্রতিবেদনে (Vol 27, No1) দেখা যাচ্ছে যে, ইরাকে যুদ্ধরত প্রায় ৩০০ আমেরিকান সৈন্যের মধ্যে ২০০৩ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া জনিত ইনফেকশন দেখা দিয়েছে যা কোন প্রচলিত ওষুধ দিয়েই সারানো যাচ্ছে না, এই ব্যাকটেরিয়াগুলো বিবর্তিত হয়ে অ্যন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে এতখানিই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে যে ডাক্তাররা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন এদের চিকিৎসা করতে। ইতিমধ্যেই ৫ জন সৈন্য মৃত্যবরণ করেছে এই রোগে। ডাক্তাররা ভয় পাচ্ছেন যে জীবাণুগুলোর খুব দ্রুত বিবর্তনের কারণে হয়তো খুব তাড়াতাড়িই আমরা এদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবো।

যে টিবি রোগকে পৃথিবী থেকে নির্মুল হয়ে গিয়েছিলো বলে আমরা ধরে নিয়েছিলাম তা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুরো দমে ফিরে এসেছে, রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এখন নতুন করে টিবি রোগের উৎপাত শুরু হয়েছে, যার উপর আগের কোন অ্যান্টিবায়োটিকই আর কাজ করছে না। ডাক্তাররা এখন রোগীর ফুসফুসের আক্রান্ত টিস্যুগুলোকে কেটে ফেলে দিয়ে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করছেন। আজকে আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া দেখা দিয়েছে যাদের মধ্যে সবচেয়ে কড়া অ্যন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখা দিয়েছে। হাসপাতালগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়, ফলে সেখানে ব্যাকটেরিয়াগুলোও বিবর্তিত হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে থাকে। আজকে হাসপাতালগুলোতে রোগীরা এক রোগ নিয়ে আসছেন আর

হাসপাতাল থেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন আরেক ধরনের এই অপ্রতিরোধ্য ব্যাকটেরিয়া দিয়ে।

> বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন কামান গোলার মত অ্যান্টিবায়োটিককে অস্ত্র হিসেবে যত্রতত্র ব্যবহার না করে বরং এখন আমাদের প্রয়োজন বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং অন্যান্য জীবাণুর বিবর্তনের গতিটাকে ঠিক মত বোঝা এবং বিশ্লেষন করা। তার উপর ভিত্তি করে পরিবেশের দূষন কমানো, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদির মাধ্যমে একসময় হয়তো আমরা এদের বিবর্তনের গতিটাকেই ঘুড়িয়ে দিতে সক্ষম হতে পারি। তখন হয়তো দেখা যাবে এই জীবাণুগুলোর ক্ষতিকর দিকটা বিবর্তিত হয়ে এতখানিই কমে গেছে যে, এরা আর মানুষের প্রানহানির কারন হতে পারছে না [৭]।

ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত আফ্রিকায় কেনো ভয়াবহ সিকেল সেল (Sickle Cell) রোগের জিনের ছড়াছড়ি?

আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে যে সিকেল সেল এ্যনেমিয়া (রক্তাল্পতা) রোগের বিষম প্রকোপ দেখা যায় তার সাথে ম্যলেরিয়া রোগের একটা আশ্চর্যরকম সম্পর্ক রয়েছে। আসুন দেখা যাক প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এধরণের চাক্ষুষ উদাহরণগুলো কিভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মুলনীতিটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরছে।

আফ্রিকা এবং ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সিকেল সেল এ্যনেমিয়া নামের এই ভয়াবহ রোগটার কারণ আর কিছুই নয়, মানুষের শরীরে একধরণের ত্রুটিপূর্ণ হিমগ্লোবিনের কারণে এই রোগের উৎপত্তি ঘটে এবং তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। হিমগ্লোবিন নামের এই জটিল অনুটির সাহায্যেই আমাদের রক্তের ভিতরের লোহিতকনিকাগুলো (red blood cells) শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন সরবরাহ করে। চারটি পাকানো পলিপেপটাইড চেইনের সমন্বয়ে একটি হিমোগ্লোবিন কণার সৃষ্টি হয় - তার মধ্যে দুটি আলফা চেইন এবং আর অন্য দুটি হচ্ছে বেটা চেইন। প্রত্যেকটি আলফা চেইনের মধ্যে ১৪১ টি এমাইনো এসিড আর প্রত্যেকটি বেটা চেইনের মধ্যে ১৪৬ টি এমাইনো এসিড থাকে, অর্থাৎ আমাদের একটি হিমোগ্লোবিন কণার মধ্যে ৫৭৪ টি এমাইনো এসিড থাকে । সুস্থ হিমোগ্লোবিন 'A' এবং সিকেল সেল হিমোগ্লোবিন 'S' এর মধ্যে গঠনগত পার্থক্য খুবই সামান্য; বেটা চেইনের ভিতরে গ্লুটামিন (Glutamin) নামের এমাইনো এসিডটি 'ভ্যালিন' (Valine) নামক এমাইনো এসিড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেলেই অসুস্থ এই হিমোগ্লোবিনের উৎপত্তি হয়। হ্যা, ব্যাপারটা একটু গোলমেলেই বটে! ৫৭৪ র টির মধ্যে মাত্র একটা এমাইনো এসিড বদলে গেলেই কি এক ভয়াবহ রোগের জন্ম হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেহে! সিকেল সেল হিমোগ্লোবিনগুলো রক্তের ভিতরের লোহিতকনিকাকে বিকৃত করে ফেলে, সাধারণ অবস্থায় এরা দেখতে চাকতির মত হলেও এই রোগের ফলে তারা কাস্তের মত আকার ধারণ করে বসে। আর গোল বাঁধে সেখানেই। এই বিকৃত আকারের লোহিতকনিকাগুলো ছোট ছোট রক্তনালীগুলোর মুখ আটকে দেয়। আর আমাদের শরীর তখন প্রতিক্রিয়া হিসেবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে

এই অস্বাভাবিক কোষগুলোকে ধ্বংস করে দিতে শুরু করে এবং তার ফলশ্রুতিতেই রোগীর শরীরে রক্তাল্পতা (Anemia) দেখা দেয়। সিকেল সেল এনেমিয়ায় আক্রান্ত কোষগুলো মাত্র ৩০ দিন বেঁচে থাকে, যেখানে রক্তের সুস্থ লোহিতকনিকাগুলো বেঁচে থাকে ১২০ দিন। অ্যানেমিয়ার কারণে এই রোগে আক্রান্ত শিশুরা খুব সহজেই বিভিন্ন ধরণের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে [৮]।

আমরা জানি যে, আমাদের দেহ কোষে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য যে দুটি করে জিন রয়েছে তার একটি আসে মার কাছ থেকে আর আরেকটি দেয় বাবা। যারা বাবা এবং মা দুজনের কাছ থেকেই সিকেল সেলে আক্রান্ত হিমোগ্লোবিনের জিন পায় তারাই এই রোগ নিয়ে জন্মায় এবং শিশু বয়সেই মৃত্যুবরন করে। আর যাদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক জিন এবং আরেকটি অসুস্থ জিন থাকে তাদের মধ্যে এই রোগের বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা সব সময় চোখে ধরা পরে না বা এত চরম আকার ধারণ করে না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এরা সুস্থভাবে জীবন যাপন করে, শুধুমাত্র কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে এ্যনেমিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকায় প্রচুর সিকেল সেল এ্যানেমিয়ার রুগী দেখা যায়, এমনকি এমনও দেখা গেছে কোন কোন গোষ্ঠীর শতকরা ৩০% লোকই এই রোগে আক্রান্ত। বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীরা স্বভাবতই প্রশ্ন করলেন, কেমন করে একটা জনপুঞ্জের মধ্যে এরকম মারাত্মক একটি বিকৃত জিন এত বেশী হারে টিকে থাকতে পারলো? প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে কি এর অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল না? আর এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য আবিষ্কার করলেন।

ভৌগলিকভাবে সিকেল সেল এনেমিয়ার জিনের বিস্তৃতির প্যাটার্নটা খেয়াল করলে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করা যায় - যে যে এলাকায় এই রোগটি দেখা যায় ঠিক সেই সেই এলাকায় এবং তার আশে পাশে ম্যালারিয়া রোগেরও প্রকোপটাও বড্ডো বেশী। দীর্ঘদিনের চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা থেকে দেখা গেলো যে, যাদের কোষের মধ্যে মাত্র একটি সিকেল সেল এ্যনেমিয়ার জিন থাকে (আরেকটি সুস্থ জিন) তাদের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকারী ক্ষমতা দুটি সুস্থ জিনের অধিকারী লোকদের চেয়ে অনেক বেশী। কি অদ্ভুত না ব্যাপারটা? কোন একসময় কোন এক মিউটেশনের ফলশ্রুতিতে হয়তো আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে এই বিকৃত

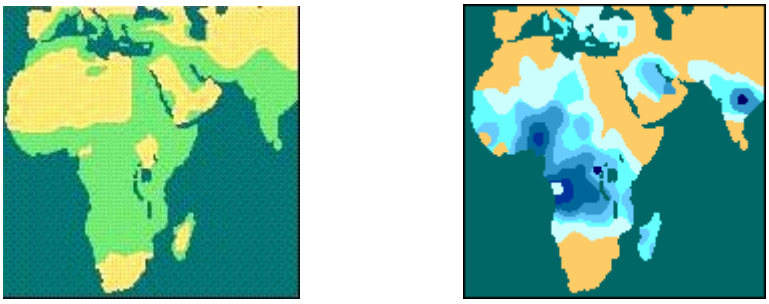

চিত্র ৪.৪ : প্রথম ছবিতে আফ্রিকা, ইওরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিস্তার দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিতে নীল রং দিয়ে দেখানো হয়েছে সিকেল সেল এনেমিয়া রোগের বিস্তার, নীল রং যত বেশী গাঢ়ো ততই প্রকোপ বেশী সেখানে এই রোগের। (সৌজন্যঃ http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/history_19)

জিনটা ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম মেনে দেখা গেলো, যে অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

বেশী সেখানে সিকেল সেল এনেমিয়ার একটা জিন ধারণকারী লোকের টিকে থাকার ক্ষমতাও বেড়ে যাচ্ছে, কারণ হিমোগ্লোবিনের এই রোগ বহনকারী জিনটা ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধে বেশী কার্যকরী ভুমিকা রাখতে পারছে। অন্যদিকে যাদের মধ্যে দুটিই সুস্থ জিন রয়েছে তারা ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অনেক বেশী হারে। তাহলে এখন প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে এখানে কি ঘটার কথা? হ্যা, এই ত্রুটিপূর্ণ জিনবহনকারী মানুষগুলোই শেষ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া রোগের চোখ রাঙানীকে উপেক্ষা করে বেশীদিন টিকে থাকতে পারছে এবং বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। তার ফলে যা হবার তাই হল, টিকে থাকার দায়েই শত শত প্রজন্ম পরে দেখা গেলো আফ্রিকাবাসীদের একটা বিশাল আংশের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে বিকৃত সিকেল সেল এনেমিয়ার জিন। কি চমৎকার একটি উদাহরণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তন তত্ত্বের!

> বিবর্তনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছরের বিভিন্ন রকমের এবং মাপের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যদি আমাদের উৎপত্তি না হত তাহলে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন অর্থই থাকতো না। একজন বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টিকর্তা কেনো এরকম হাজারো দুর্বলতা, বিকৃতি এবং গোঁজামিল দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে তৈরি করতে যাবেন? কেনো তাকে এক রোগ সারাতে গিয়ে জন্য আরেক রোগের বীজ পুড়ে দিতে হবে শরীরে? কাজেই মানুষের কল্পনায় সৃষ্টি অলৌকিকত্ব দিয়ে নয়, বরং একমাত্র বিবর্তনবাদের মাধ্যমেই এই ধরনের ঘটনাগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, প্রকৃতিতে এধরনের হাজারো ঘটনা রয়েছে যা প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব বা 'ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন' তত্ত্ব দিয়ে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

এতক্ষণ আমরা দেখলাম বিভিন্ন ধরণের মাইক্রো বিবর্তনের (microevolution) উদাহরণ যেখানে প্রজাতির ভিতরেই বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটছে। এরকম হাজারটা উদাহরণ রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখছি যে, ভৌগলিকভাবে একটা প্রজাতির কিছু অংশ আলাদা হয়ে গেলে তাদের মধ্যে এধরণের ছোট ছোট পরিবর্তনগুলো জমতে জমতে একসময় এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে তারা আগের সেই বিচ্ছিন্ন অংশের থেকে এক্কেবারেই আলাদা প্রজাতিতে পরিণত হয়। তখন চাইলেও আর আগের জাতভাইদের সাথে মানে আগের স্বজাতীয় প্রানীগুলোর সাথে তাদের অন্তঃপ্রজনন আর সম্ভব হয় না; ফলে একই প্রজাতির দুই দল সম্পুর্ণ দুটি আলাদা প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রকম অবস্থা থেকেই ঘটে মাইক্রোবিবতনের 'বড়দা' macroevolution বা ম্যাক্রো-বিবর্তন। ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও নতুন প্রজাতি তৈরি হতে দেখা গেছে, এমনকি বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণী তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন, ডবঝানস্কি এবং পাভলভস্কি ১৯৭১ সালে ড্রসোফিলা নিয়ে অন্তরনের পরীক্ষার মাধ্যমে ড্রসোফিলার ভিন্ন একটি প্রজাতি উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছিলেন [৯]। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পলিপ্লয়ড, এলোপলিপ্লয়ডের মাধ্যমে ল্যাবরেটরীতে কোয়ান্টাম প্রজাতি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলোতে এ ধরনের সফল পরীক্ষার অনেক উদাহরণ আছে [১০]।

বস্তুতঃ বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ আজ এতোই বেশী যে সেগুলোকে অস্বীকার করার অর্থ অনেকটা পৃথিবীর গোলত্বকে অস্বীকার করার মতই। বিবর্তনের পক্ষে যে সমস্ত সাক্ষ্য হাজির করা যায় তা হল : প্রাণ রাসায়নিক প্রমাণ, কোষবিদ্যা বিষয়ক প্রমাণ, শরীরবৃত্তীয় প্রমাণ, সংযোগকারী জীবের (connecting link) প্রমাণ, ভৌগলিক বিস্তারের (Geographical distribution) প্রমাণ, তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানের প্রমাণ, শ্রেনীকরণ সংক্রান্ত প্রমাণ, নিষ্ক্রিয় বা বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গের প্রমাণ ইত্যাদি। আর ফসিল থেকে পাওয়া হাজারো সাক্ষ্য-প্রমাণ তো আছেই। আজকে সরীসৃপ থেকে কিভাবে পাখী বিবর্তিত হয়েছে তারও প্রায় সম্পূর্ণ ধাপগুলো পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ, সরিসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তনের মধ্যবর্তী ধাপগুলোও। বিশেষ করে সরিসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীবে বিবর্তনের সম্পূর্ণ ধাপগুলো আজকে খুব ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত; মধ্যবর্তী ধাপগুলো এতোই পরিস্কার যে বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত দ্বিধায় পড়ে যান এই ভেবে যে এগুলোকে ‘mammal-like reptile’ বলবেন নাকি ‘reptile-like mammal’ বলবেন [১১]। Synapsids, Therapsida, Cynodonta থেকে শুরু করে আদি স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত সবগুলো ধাপের একাধিক ফসিল পাওয়া গেছে। এমনকি তাদের চোয়াল কিভাবে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়ছে সেগুলোও ফসিল থেকে উদ্ধার করা গেছে [১২]।

বিজ্ঞানীরা কেবল ফসিলের উপরেই নির্ভর করে বসে নেই, তারা প্রাণীদেহে ম্যাক্রো-বিবর্তনের জন্য দায়ী একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিন খুঁজে বের করেছেন যার নাম Ubx complex। এডোয়ার্ড লিউস এর জন্য ১৯৯৫ সালে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। এই Ubx জিন আসলে বহুল-খ্যাত Hox জিনের একটি। এই জিনগুলোই আসলে প্রাণীদেহের কাঠামোর নিরব পরিকল্পনাকারী। এ জিনগুলোই বলে দিচ্ছে একটি মাছির কয়টি পাখা থাকবে আর মাকড়শার কয়টি পা থাকবে। এগুলো সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ফ্রুট-ফ্লাই-এ, পরে সেগুলো মাছ, ব্যাঙ কিংবা মানুষেও সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সনাক্ত করা হয়। এগুলোর সামান্য অদলবদলেই বাহ্যিক গঠনে যে বিপুল পরিবর্তন করা সম্ভব তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজ নিশ্চিত (এ বইয়ের পরিশিষ্টে এ নিয়ে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। আসলে জীববিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান, জেনেটিক্স এবং আনবিক জীববিদ্যার কোন শাখাই বিবর্তনের কোন সাক্ষ্যের বিরোধিতা তো করছেই না, বরং যত দিন যাচ্ছে বিবর্তনের ধারাটি সবার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে; বিবর্তনতত্ত্ব দিন দিন হয়ে উঠছে এক কথায় অপ্রতিরোধ্য।

বিবর্তনবাদ বিরোধীরা প্রায়ই বলে থাকেন যে, মাইক্রো-বিবর্তন ঘটতে দেখা গেলেও ম্যাক্রো-বিবর্তন নাকি কখনই দেখা যায়নি - মজার ব্যাপার হচ্ছে তাদের অন্যান্য প্রচারণাগুলোর মতই এটাও এক্কেবারেই উদ্দেশ্যপ্রনোদিত এবং মিথ্যা। চলুন তাহলে এবার এধরণের কিছু উদাহরণ নিয়েই আলোচনা করা যাক। কোন জীবের চারিদিকের পারিপার্শ্বিকতা, বংশবৃদ্ধির এবং মিউটেশনের হার ও গতি প্রকৃতি, জিনপুলের প্রভাব ইত্যাদির অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে এই ম্যাক্রো-বিবর্তন ঘটবে কি ঘটবে না। সাধারণত আমাদের এক জীবনকালের সীমিত সময়ের মধ্যে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে দেখা যায় না। এটা ঘটতে হাজার, লক্ষ বা কোটি বছরও লেগে যেতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো প্রকৃতিতে কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুব দ্রুতও ঘটে যেতে পারে এই বিবর্তন প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানীরা একটু অবাকই হয়েছিলেন প্রথমে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন যে, বিবর্তন দ্রুত, অত্যন্ত দ্রুত, ধীরে বা অত্যন্ত ধীরে - সব ভাবেই ঘটতে পারে। এ প্রসঙ্গে ডঃ রিচার্ড ডকিনসের সাম্প্রতিক মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য

: "Evolution, for instance, normally takes too long to make an impact within a human lifespan..... The amazing thing is how alarmingly fast evolution can sometimes go, when conditions are right. Let's hope bird flu won't turn out to be an example."

আগের লেখাগুলোতে বিভিন্ন ধরণের মাইক্রো বিবর্তনের উদাহরণ দেখেছি আমরা, এখন চলুন ম্যাক্রো বিবর্তনের কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

উদ্ভিদের নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হচ্ছে অহরহ

আমাদের চোখের সামনে প্রাকৃতিকভাবে মিউটেশনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভবের ঘটনাটা একটু বিরলই বটে। তবে এধরনের ঘটনা যে একেবারে ঘটেই না তাও নয়। বিজ্ঞানীরা গত একশো বছরে বেশ কিছু উদ্ভিদের মধ্যে এধরণের নতুন প্রজাতি তৈরির ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর ল্যাবরেটরিতে নতুন ধরনের আরও উন্নত ফলনশীল ধান, গম বা ভুট্টার প্রজাতি তৈরির ঘটনা তো হরহামেশা আমরা খবরের কাগজেই দেখতে পাই।

১৯১০-১৯৩০ এর মধ্যে আমেরিকার ওয়াশিংটন এবং আইডাহো স্টেটে স্যালসিফাই নামে অনেকটা মুলার মত দেখতে এক ধরণের খাদ্যযোগ্য মুলের গাছের তিনটি প্রজাতির (Tragapogon dubius, Tragapogon pratensis, Tragapogon porrifolius) চাষ শুরু করা হয়। এর আগে আমেরিকায় স্যালসিফাই এর কোন অস্তিত্বই ছিলোনা, এদেরকে ইউরোপ থেকে এনে প্রথমবারের মত এখানে বোনা হয় [১৩]। ১৯৫০ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা আবাক হয়ে দেখলেন, তিনটি তো নয়, পাঁচ ধরণের স্যালসিফাই দেখা যাচ্ছে মাঠে! তাহলে এই নতুন দু'ধরণের প্রজাতি এলো কোথা থেকে? এরা তো ইউরোপ থেকে আনা প্রথম তিনটি প্রজাতির সাথেও প্রজননেও সক্ষম নয়, তাহলে কি এখানে সম্পুর্ণ দু'টি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে এই কয়েক দশকের মধ্যেই? - ব্যাপারটা আসলেই তাই, বিস্মিত বিজ্ঞানীরা নিজের চোখে দেখলেন প্রকৃতিতে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ঘটনা। প্রথম তিনটি প্রজাতি থেকে পলিপ্লয়ড সংকরায়নের (poliploid hybridization) ফলে দুটি নতুন প্রজাতির জন্ম হয়েছে। আমরা জানি যে, সাধারণত সন্তানেরা তাদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য বাবা এবং মার প্রত্যেকের থেকে একটি করে ক্রোমজোম পেয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটছে একটু গোলমেলে ভাবে। মিউটেশনের ফলে নতুন প্রজাতিগুলোর মধ্যে মা বাবার দুজনের থেকেই এক সেটের বদলে দুই সেট করে ক্রোমজোম এসেছে। এর ফলে এরা নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম হলেও মা বাবার প্রজাতির স্যালসিফাই এর সাথে আর প্রজনন করতে পারছে না। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, এখানে মিউটেশনের ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ দুটি নতুন প্রজাতির জন্ম হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে আমাদের চোখের সামনেই। গত কয়েক দশকে জেনেটিক্সের অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা এই নতুন প্রজাতিগুলোর ডিএনএ-র কোথায় কিভাবে এই মিউটেশনগুলো ঘটেছিলো তার সম্পূর্ণ চিত্রটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন আমাদের সামনে ।

আমরা এখন কৃত্রিমভাবে পলিপ্লয়েড সংকরায়ন সহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ তৈরি করতে সক্ষম। আমাদের বাগানে যে সব ডালিয়া, টিউলিপ বা আইরিস ফুলের সমারোহ দেখা যায় তাদের বেশিরভাগ প্রজাতিকেই কিন্তু কোন না কোন সময় কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ধরণের ফসলের উদ্ভিদও তৈরি করা হচ্ছে এ নিয়মে। প্রকৃতিতেও, বিশেষ

করে উদ্ভিদের মধ্যে, এই পলিপ্লয়েড সংকরায়নের প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়।

এক জেনারেশনেই কি বিবর্তন সম্ভব?

বিজ্ঞানীরা তো আজকে সেটাই বলছেন - বলছেন, প্রাণীর বিবর্তনের পদ্ধতিকে খুব জটিল এবং দীর্ঘ মেয়াদী হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কোন কোন সময় এক জেনারেশনে কিংবা শুধুমাত্র একটি জীনের পরিবর্তনের ফলেই বিবর্তন ঘটে যাওয়া সম্ভব, এবং তারা তা ইতোমধ্যে প্রকৃতিতে এবং ল্যাবরেটরিতে প্রমাণও করে ছেড়েছেন। স্টিকেলব্যাক (sticlebacks) বলে এক ধরণের মাছ আছে, এদের বিভিন্ন প্রজাতিকে সমুদ্রের লোনা পানি এবং নদীর মিঠা পানিতেও সমানভাবে দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের মতে মাত্র হাজার দশেক আগে, সর্বশেষ বরফ যুগের শেষে, যখন পানির উচ্চতা বেড়েগিয়েছিলো তখনই তাদের একটা অংশ সমুদ্র থেকে নদীতে গিয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে নদীর পানির নতুন পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়ে যায়। সমুদ্রের মাছগুলোর গায়ে ৩৫টি বাড়তি প্লেটের মত হাডডি বা কাঁটার স্তর দেখা যায়, যা দিয়ে তারা নিজেদেরকে ভয়ঙ্কর সব সামুদ্রিক শিকারী প্রাণীর দাঁতালো আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু নদীতে বাস করা স্টিকেলব্যাকের প্রজাতিগুলোর জন্যে তো আর নিজের দেহে এত ভারী ভারী যুদ্ধাস্ত্র বয়ে বেড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। তাই তারা বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়ই অভিযোজিত হয়ে এই অপ্রয়োজনীয় স্তরটা থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বের

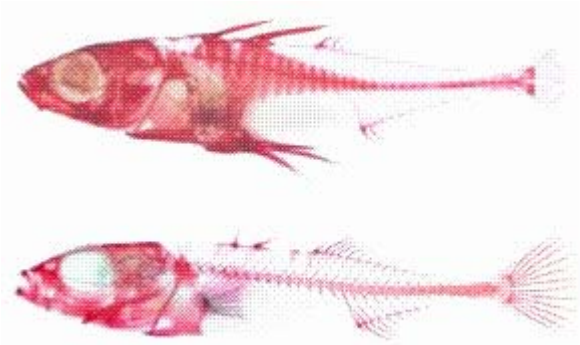

চিত্র ৪.৫: সামুদ্রিক(উপরে) এবং নদীর (নীচে) স্টিকেলব্যাকের গঠন
(সৌজন্যঃ http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050325224057.htm)

করেছেন যে, এই বিবর্তনের পিছনে কাজ করছে Pitx1 gene নামে একটি মাত্র জিন। গত বছর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, সমুদ্র থেকে নদীর পানিতে মাছগুলোকে স্থানান্তরিত করা হলে তারা নাকি এক জেনারেশনেই এই বিবর্তনটা ঘটিয়ে ফেলতে পারে, এই বাড়তি স্তরটি আর থাকে না তাদের পরের প্রজন্মে। শুধু তাই নয়, আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটির জেনেটিসিস্ট ডঃ কিংসলির দলটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তা হাতে নাতে পরীক্ষা করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা এই বিশেষ জিনটিকে সমুদ্রের মাছের কোষ থেকে আলাদা করে নদীর মাছের ডিমের মধ্যে ইঞ্জেকশেন দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এই ডিম থেকে বের হওয়া মাছের পোনার মধ্যে ঠিকই বাড়তি কাঁটার স্তরটা

জন্ম লাভ করেছে যা তাদের পূর্ব প্রজন্মে ছিলো না।

> বিজ্ঞানীরা একটু অবাকই হয়েছেন প্রকৃতিতে বিবর্তনের এত সহজ এবং দ্রুত একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরে, এত বড় একটা পরিবর্তনের জন্য যে মাত্র একটা জীনই দায়ী হতে পারে তাও তারা আশা করেননি। তারা এখন বলছেন যে, প্রকৃতিতে হয়তো খুব খুব সরল উপায়েও বিবর্তন ঘটে এবং তা খুব সহজেই খুঁজে বের করা সম্ভব [১৪]।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ানের দু'পাড়ের কাঁঠবিড়ালীগুলো কিভাবে বদলে গেলো?

আমেরিকার গ্রান্ড ক্যানিয়ানেও দু ধারে খুব কাছাকাছি দেখতে দু'প্রজাতির কাঠ বিড়ালী বা স্কুইরেল দেখা যায়। তারা দেখতে শুনতে ব্যবহারে প্রায় এক রকম হলেও একে অপরের সাথে প্রজননে অক্ষম। এই প্রকান্ড এবং দুর্ভেদ্য গিরিখাতের দক্ষিণ দিকের কালো পেট আর সাদা লেজ সহ প্রজাতিটির নাম হচ্ছে *কাইবাব* কাঠবিড়ালী আর উত্তর দিকের সাদা রং এর পেট এবং ধুসর রং এর লেজ সহ প্রজাতিটার নাম হচ্ছে *অ্যাবার্ট* কাঠবিড়ালী। সর্বশেষ বরফ যুগে গ্রান্ড ক্যানিয়ানের পরিবেশ এবং গাছগাছালিতে বিশাল পরিবর্তন ঘটে যায়। এর আগে কিন্তু তারা একই প্রজাতিই ছিলো এবং এক ধরনের বিশেষ পাইন গাছের কান্ড খেয়েই এরা বেচে থাকে। কিন্তু বরফযুগে গিরিখাতের মাঝখানের সমস্ত পাইন গাছ ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়, তারা হয়ে পড়ে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন। আর তার ফলশ্রুতিতেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তাদের বিবর্তন ঘটতে থাকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে, ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন নিয়মে। দীর্ঘ দিন ধরে স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তনের ফলে তারা আজকে সম্পুর্ন দু'টি ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এরকমই একটা উদাহরণ দেখেছিলাম গ্যালাপ্যগাস দ্বীপপুঞ্জে ডারউইনের দেখা বিভিন্ন প্রজাতির ফিঞ্চদের মধ্যে। প্রায় ৫ লাখ বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এক ধরণের ফিঞ্চ পাখি থেকে এখন গ্যালাপ্যগাস দ্বীপপুঞ্জে ১৪ ধরণের স্বতন্ত্র প্রজাতির ফিঞ্চের জন্ম হয়েছে।

টিকটিকিগুলো এরকম রিং এর মত করে তাদের বাসা সাজালো কেনো?

আরও মজার মজার কিছু উদাহরণ রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই। রিং বা চক্রাকার প্রজাতির উদাহরণটির কথা উল্লেখ না করলে বিবর্তনের গল্পটা যেনো অসম্পুর্ণই রয়ে যাবে। আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম উপকুল এলাকা ধরে কয়েক প্রজাতির টিকটিকি (Ensatina eschscholtzii group) মিলে এধরনের একটা রিং তৈরি করেছে। গত শতাব্দীতে ডঃ রবার্ট স্টেবিনস প্রথম এদেরকে পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন যে, এদের পুর্বপুরুষেরা যখন উত্তর থেকে দুই দিকে ভাগ হয়ে দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়তে থাকে (নীচের ছবিতে দেখুন) তখনই শুরু হয়েছিলো এই রিং তৈরির চক্রাকার খেলা [১৫] । তারপর যতই তারা দু'দিকে থেকে দুরে সরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকলো ততই তাদের মধ্যে ভিন্ন ধারায় বিবর্তন ঘটতে শুরু করলো।

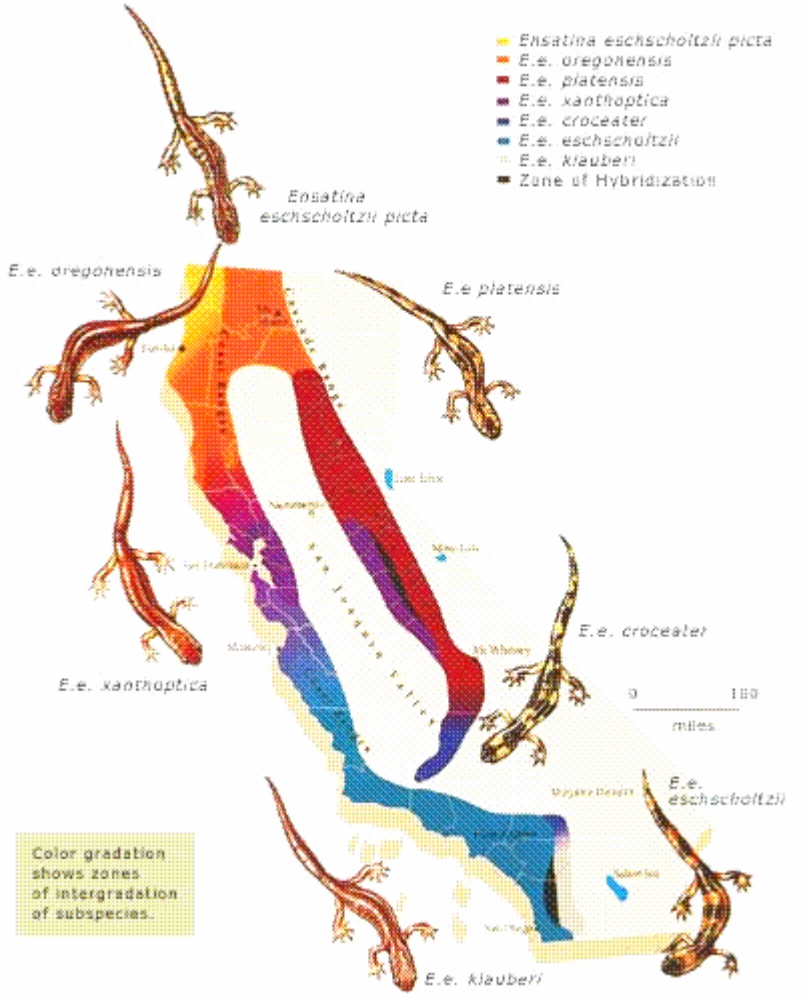

চিত্র ৪.৬: টিকটিকির চক্রাকার প্রজাতি সৃষ্টি (Ring Species of Salamanders in Western USA)
সৌজন্যঃ http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/05/2/images/l_052_05_l.jpg

তারপর দীর্ঘদিন পরে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া স্যান ডিয়াগোতে এসে যখন তারা আবার মিলিত হলো তখন ইতোমধ্যেই তারা দূটি ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে আর প্রজনন সম্ভব হচ্ছে না । অনুজীববিদ্যা এবং ডি.এন.এ সিকোয়েন্সিং এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এখন এদের জীনের বৈশিষ্ট্যগুলোও খুঁজে বের করেছেন [১৫], আর তাদের পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ডঃ স্টেবিনস ঠিকই ধরেছিলেন - ক্রমান্বয়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে হতেই এদের মধ্যে এক প্রজাতি থেকে বিভিন্ন প্রজাতির জন্ম হয়েছিলো। আপনি উত্তরে, রিং এর গোড়া থেকে জীনের ধারা পরীক্ষা করতে করতে যতই দু'ধার বেয়ে দক্ষিণে নেমে যেতে থাকবেন ততই দেখবেন ধারাবাহিকভাবে জীনের গঠন এবং বৈশিষ্ট্যগুলো বদলে যাচ্ছে।

এধরনের রিং প্রজাতিগুলো বিবর্তনবাদের মূল বক্তব্যকে অত্যন্ত

জোড়ালোভাবে তুলে ধরে – একদিকে তারা যেমন ক্রমান্বয়ে ঘটা বিবর্তনের সহ-বিবর্তনের এক মজার উদাহরণ

বিজ্ঞানের চোখে একটা সুদৃঢ় তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এর সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎবানী করার ক্ষমতা। মানে, আপনার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটা যদি ঠিক হয়ে থাকে তা দিয়ে আপনি ভবিষ্যতের অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারবেন, যা হয়তো এখন চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে না। যেমন, পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইন যখন সর্বপ্রথম আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্বটি (General Theory of Relativity) প্রকাশ করলেন, তখন সেতত্ত্বের মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে ছিলো মহাবিশ্বের প্রসারণের সম্ভাবনা, কিংবা ব্ল্যাক হোল নামের রহস্যময় বস্তুর অস্তিত্বের আলামত যা থেকে আলো পর্যন্ত পালাতে পারে না। এগুলো সবগুলোই পরবর্তীতে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। কাজেই আইনস্টাইনের তত্ত্বটি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সার্থক একটি তত্ত্ব। আর ঠিক একইভাবে, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখি ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের অকল্পনীয় সার্থকতা - আজ থেকে দেড়শো বছর আগে সীমিত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তিনি এমনই এক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন যার সঠিকতা ও যৌক্তিকতা যে বারবার প্রমানিত হয়েছে তাই শুধু নয়, এমনকি এ প্রসঙ্গে তার দেওয়া বিভিন্ন প্রকল্প এবং ভবিষৎবানীগুলোও মিলে গেছে! মজার একটা কাহিনী শোনা যাক তাহলে এবার। ডারউইন লন্ডনের এক গ্রীন হাউসে মাদাগাস্কারের বিশেষ একটা অর্কিড দেখেন যার মধু রাখার পুষ্পাধারটি ১১ ইঞ্চি লম্বা (চিত্র ৪.৭ দ্রষ্টব্য)। তিনি তা দেখে মন্তব্য করেন যে, মাদাগাস্কারের যে জায়গায় এই অর্কিডটা দেখা যায়, সেখানে এমন এক ধরনের মথ জাতীয় কোন পোকা থাকতেই হবে যাদের সুর বা হুল হবে একই রকমের লম্বা। কারণ এই লম্বা মধুর পুষ্পাধারের ভিতর শুর ঢুকিয়ে মধু খাওয়ার সময়ই মথগুলো অর্কিডটার পরগায়ন ঘটাবে। এবং তাইই হলো - কয়েক দশক পরে বিজ্ঞানীরা ঠিকই খুঁজে পেলেন সেই মাদাগাস্কার স্ফিংস মথ Xanthopan morganii praedicta। প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকার সংগ্রামে

চিত্র ৪.৭: মাদাগাস্কার স্ফিংস মথ Xanthopan morganii praedicta এবং অর্কিড AngraecumSesquipedale

(সৌজন্যে : National Geographic ম্যাগাজিন)

টিকে থাকার জন্য অনেক প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যেই এ ধরণের সহযোগীতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়, এবং তার প্রয়োজনেই তারা দুজনেই অভিযোজিত হতে থাকে। আর একেই বলে সহ-বিবর্তন (co-evolution)। প্রকৃতিতে এমন কোন জীব নেই যে শুধু নিঃস্বার্থভাবে অন্য প্রজাতির সেবা করার জন্য বেঁচে থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই সে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য। ডারউইন তার *Origin Of Species* বইতে তার পাঠকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এ ধরণের একটা প্রজাতি খুঁজে বের করার জন্য, এবং আজ পর্যন্ত কেউ সে চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে পারেনি।

বিভিন্ন ধাপগুলোকে স্পষ্ট করে প্রতিষ্ঠিত করে, আবার অন্যদিকে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে কিভাবে ধীরে ধীরে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়

তারও সাক্ষ্য বহন করে।

এ ধরণের পরীক্ষা করে ল্যাবরেটরিতে একই রকমের ফলাফল পাওয়া গেছে। ডড (Dodd, 1989), রাইস এবং হসটারট (Rice & Hostert, 1993) সহ আরও অনেক বিজ্ঞানীই ফ্রুট ফ্লাই নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, কিছু ফ্রুট ফ্লাইকে প্রজননগতভাবে আলাদা করে ফেলে ভিন্ন পরিবেশে বড় করলে, বেশ কিছু জেনারেশন পরে তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তৈরি হতে দেখা যায়। নতুন পরিবেশের সাথে ক্রমাগতভাবে অভিযোজিত হতে হতে এক সময় তারা এতই বদলে যায় যে, আর একে অপরের সাথে প্রজনন করে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না, পরিণত হয় এক নতুন প্রজাতিতে [১৫]। এরকম ধরণের বহু পরীক্ষাই করা হয়েছে গবেষণাগারে গত এক শো বছরে, তাদের ফলাফলগুলোও আমাদের হাতের কাছেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আজকের দিনে বাজারে গিয়ে ট্যাকের পয়সা খরচ করে বই কিনে তো আর এগুলো তথ্য খুজে বের করার প্রয়োজন হয় না, যে কেউ ইচ্ছে মাফিক Google এ একটা সার্চ দিয়েই পেয়ে যেতে পারেন এধরণের উদাহরণ বা পরীক্ষার শ'য়ে শ'য়ে রিপোর্ট।

শেষের কিছু কথা

এ ধরণের উদাহরণের কিন্তু কোন শেষ নেই, বিজ্ঞানীরা গত একশো দেড়শো বছরে যে পরিমাণ গবেষণা করেছেন বিবর্তন নিয়ে তা এক কথায় 'অচিন্তনীয়', কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখবো তা ঠিক করাই যেনো একটা কঠিন কাজ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন স্তরে পাওয়া ফসিল, বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে শারীরিক এবং জেনেটিক সাদৃশ্য, বিলুপ্তপ্রায় অংগগুলোসহ বিবর্তনবাদের পক্ষে পাওয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এখন পর্যন্ত যত ফসিল রেকর্ড পাওয়া গেছে তার সবগুলোই একবাক্যে বিবর্তনবাদের পক্ষে রায় দিয়েছে। ফসিলবিদ এবং জীববিজ্ঞানীরা যখন প্রথমবারের মত বলেছিলেন যে ডলফিন এবং তিমি মাছ এক সময় বিবর্তিত হয়ে ডাঙ্গার প্রাণী থেকে জলচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে তা 'অসম্ভব' ভেবে নিয়ে বিবর্তনবাদ-বিরোধীরা মহা হইচই শুরু করে দিয়েছিলেন। অথচ আজকে ফসিলবিদরা এমন কিছু ফসিল খুঁজে পেয়েছেন যা দিয়ে তিমি বা ডলফিনের বিবর্তনের একটি বা দু'টি মধ্যবর্তী স্তর নয় বরং পাঁচ পাচটি স্তরকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। বিবর্তনবাদের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত চমৎকার উদাহরণ, এবং এ নিয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে।

বিজ্ঞানীরা মাটির ভিন্ন স্তরে পাওয়া লাখ লাখ ফসিলের মধ্যে এমন একটি ফসিলও এখনও খুঁজে পাননি যা কিনা জীবের বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে সমর্থন করে না। এরকম একটা ফসিলও যদি বের হয় এবং বিবর্তনবাদ দিয়ে যদি তার ব্যাখ্যা না দেওয়া যায় তাহলেই বিবর্তনবাদের তৈরি বিজ্ঞানের এই শক্ত ইমারতটি হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পরতে পারে। একবার বিখ্যাত

> জীববিজ্ঞানী জে বি হ্যালডেন কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো কি দিয়ে বিবর্তনকে ভুল বলে প্রমাণ করা যাবে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন যদি কেউ প্রিক্যাম্ব্রিয়ান যুগে একটা খরগোশের ফসিল খুঁজে বের করে দিতে পারে তাহলেই হবে। সব ভালো তত্ত্বের মতই বিবর্তনবাদও ভুল বলে প্রমানিত হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা তো ঘটেইনি , বরং এর উলটোটাই ঘটে চলেছে আজকে দেরশো বছর ধরে।

গত কয়েক দশক ধরে অনুজীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের কল্যাণে বিবর্তনের পক্ষে আরও সুক্ষ্ম এবং নিখুঁত সব প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর কিছু উদাহরণ আমরা উপরেও দেখেছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মেনডেল কতৃক জিনের আবিষ্কার আর ষাটের দশকে ডিএনএ-এর আবিষ্কার যেনো বিবর্তনবিদ্যার জন্য জীয়ণকাঠি হিসেবে কাজ করেছিলো। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী আর্নেষ্ট মায়ার তার ২০০১ সালে প্রকাশিত *What Evolution Is* বইতে বলেছিলেন, অনুজীববিজ্ঞান যখন আবিষ্কার করলো যে, জীবের দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুগুলোও (জীন, প্রোটিন ইত্যাদি) তার দেহের বিবর্তনের সাথে সাথে একইভাবে বিবর্তিত হয় সটি ছিলো আমাদের জন্য একটি অপ্রত্যাশিতরকম সুখের খবর। আমরা এখন আমাদের জীনের মধ্য থেকেই খুঁজে পেতে পারি বিবর্তনের কোটি কোটি বছরের অলিখিত ইতিহাস। Richard Dawkins তার ২০০৪ সালে প্রকাশিত Ancestor's Tale বইতে বলেছিলেন ,

> 'The DNA information in all living creatures has been handed down from remote ancestors with prodigious fidelity. The individual atoms in DNA are turning over continually, but the information they encode in the pattern of their arrangement is copied for millions, sometimes hundreds of millions, of years. We can read this record directly, using the arts of modern molecular biology to spell put the actual DNA letter sequences or, slightly more indirectly, the amino acid sequences of protein into which they are translated.' [১৬]

বিজ্ঞানীরা এখন এধরণের বিভিন্ন ধরণের গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন, ২০০৩ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা মিলে প্রথমবারের মত মানুষের জীনের সিকোয়েন্সিং করে শেষ করেছেন। হিউমান জিনোম প্রজেকটের ডিরেকটর ফ্রান্সিস কলিন্স তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন, আমাদের জিনোম (জীবের পুর্নাঙ্গ জেনেটিক তথ্য) আসলে একটি বইয়ের মত যাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। একদিকে একে ইতিহাসের বই হিসেবে ব্যবহার করা যায় যেখানে আমাদের প্রজাতির বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। অন্যদিকে এ হচ্ছে কোষ তৈরির একটি ব্লু প্রিন্ট যা অবিশ্বাস্যরকমের বিস্তারিত নির্দেশাবলী দিয়ে পরিপূর্ণ। আর চিকিৎসা জগতের জন্য এটি হচ্ছে এমনি একটি পাঠ্যবই যা কিনা বিভিন্ন ধরণের রোগ ঠেকানো এবং চিকিৎসার জন্য নতুন এক মহাশক্তি হিসেবে কাজ করবে [১৭]। বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা মানুষ, শিম্পাঞ্জী, ইঁদুর, কুকুর, গরু, ফ্রুট ফ্লাই সহ বিভিন্ন প্রাণীর জীনের সিকোয়েন্সিং করেছেন বা করার কাজে নিয়োজিত আছেন।

যে প্রাণী বিবর্তনের ঘড়ির হিসেব অনুযায়ী যত কাছাকাছি সম্পর্কিত ততই তাদের জেনেটিক গঠনও একই রকমের। আমাদের নিজেদের কথাই ধরা যাক, এতক্ষণ তো আমাদের চারপাশের গাছপালা, জীব জন্তুর বিবর্তনের গল্প শুনলাম, নিজেদের প্রজাতির কথাটা বলে লেখাটা শেষ না করলে হয়তো খামতি থেকে যাবে। আমরা এবং শিম্পাঞ্জীরা মাত্র ৫-৮ মিলিয়ন বছর আগে সাধারণ পূর্ব পুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ নামের এই প্রজাতিতে পরিণত হয়েছিলাম। উনিশ শতাব্দীতে ডারউইন এবং টি এইচ হাক্সলি যখন প্রথম এই কথাটি বলেছিলেন তখন সারা পৃথিবী জুড়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিলো। ধর্মাপ্রাণ মানুষেরা তো বিবর্তনবাদকেই অস্বীকার করেছিলো, আর যারা অন্যান্য জীবের বিবর্তনকে যাওবা সঠিক বলে মনে করেছিলেন তাদের পক্ষেও নিজেকে ওই শিম্পাঞ্জীগুলোর উত্তরসুরী বলে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে দাড়িয়েছিলো। এই তো সেদিন - ২০০৫ সালের সেপটেম্বর মাসে বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মত মানুষ এবং শিম্পাঞ্জীর জিনোমের পাশাপাশি বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত করলেন যে, বিজ্ঞানীরা এত দিন ধরে ঠিকই ধারণা করে আসছিলেন। আসলেই আমাদের সাথে আমাদের এই পুর্বপুরুষের ডি এন এ ৯৮.৭% ই এক - আমরাও আসলেই এক ধরণের উন্নত প্রজাতির বানর ছাড়া আর কিছুই নই [১৮]। আমাদের হিমোগ্লোবিনের সাথে শিম্পাঞ্জীর হিমোগ্লোবিনও প্রায় হুবহু মিলে যায়।

শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা কিছুদিন আগে তাদের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধাঁধারও উত্তর পেয়েছেন জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের কল্যাণেই। আমরা বহুদিন ধরেই জানেন যে শিম্পাঞ্জীর কোষে ২৪ জোড়া ক্রোমজোম থাকলেও মানুষের কোষে আছে মাত্র ২৩ জোড়া। মানুষ এবং শিম্পাঞ্জী যদি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকেই বিবর্তিত হয়ে আসবে তাহলে আরেক জোড়া ক্রোমজোমের হোলটা কি? উধাও তো হয়ে যেতে পারে না হঠাৎ করে, আর সেটা হলে ব্যাপারটা মোটেও কোন ভালো দিকে গড়াতো না। তাই তারা ধারণা করে আসছিলেন যে নিশ্চয়ই বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে মানুষের কোন দু'টো ক্রোমজোম একে অপরের সাথে জোড়া লেগে গেছে বা মিলে গেছে। আর তা যদি না হয় তাহলে শিম্পাঞ্জীর সাথে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকেথেকে মানুষের বিবর্তনের এই পুরো ধারণাটাকেই ভুল বলে ধরে নিতে হবে! বিজ্ঞানের বোধ হয় এখানেই মাহাত্ম্যটা, কোন যুক্তি প্রমাণ দিয়ে একে ভুল দেখানো গেলে তা যত বড় আবিষ্কারই হোক না কেনো তাকে বিনা দ্বিধায় আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দিতে কার্পণ্য করেন না বিজ্ঞানীরা। সাইটোজেনিক্স (Cytogenetics) গবেষণা থেকে ঠিকই বের হল যে, আমাদের ২ নম্বর ক্রোমজোমটির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এর উত্তর। আমাদের পূর্বপুরষের দু'টি ক্রোমজোম এক হয়ে মিলে গেছে মানুষের এই ক্রোমজোমটির মধ্যে [১৯]। বিবর্তনের ধারা বুঝে জীন সিকোয়েনসিং করার মাধ্যমে শুধু যে আমরা আমাদের পূর্বসুরীদের সম্পর্কে জানতে পারছি তাই নয়, এর ফলে চিকিৎসাবিদ্যার অঙনে এক নীরব বিপ্লব ঘটে চলেছে। যেমন ধরুন না, এই অ্যালজাইমার রোগটির কথাই - একটিমাত্র জীনের (caspase-12 gene) অনুপস্থিতির কারণে স্মৃতিবিভ্রমজনিত যে রোগটি ঘটে, সেই রোগটি কিন্তু আমাদের পূর্বপুরষসহ বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে খুজে পাওয়া ভার। তার অর্থ দাড়াচ্ছে দু'টি, প্রথমতঃ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কোন একসময় এই জিনটা আমরা হারিয়েছি, আর দ্বিতীয়তঃ এই জিনটাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে অর্থাৎ কোন্ মেকানিজমের সাহায্যে এই রোগ থেকে তারা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে তা খুঁজে বের করতে পারলে হয়তো আমরা এই দুরারোগ্য ব্যাধিটা নিরাময়ের একটা উপায়ও পেয়ে যেতে পারি [২০]।

বিবর্তনের উদাহরণ আমাদের চারপাশে, ছোটটো পৃথিবীটার বুকে এই অফুরন্ত প্রাণের স্পন্দনের উৎসই হচ্ছে বিবর্তন। একটু চোখ মেলে বাইরের পৃথবীটার দিকে তাকিয়ে দেখলেই আর একে অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আজকে আমাদের সারা পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষই হয়

বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কিছুই জানেন না, বা জানলেও তাতে বিশ্বাস করেন না অথবা আরেক ডিগ্রি অগ্রসর হয়ে এর বিরুদ্ধে যারপর নাই মিথ্যা প্রচারণা চালান। অথচ সাম্প্রতিককালে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের জয়জয়কারের পিছনে এর অবদান অপরিসীম। চিকিৎসাবিদ্যা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা ওষুধ, কীটনাশক ও উচ্চফলনশীল শষ্য তৈরির ক্ষেত্রেই তো শুধু নয়, জীববিজ্ঞানের সবগুলো শাখার মিলনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বিবর্তনবিদ্যা। আমাদের চারদিকের প্রাণের বিস্তৃতিকে বিবর্তনের আলোয় বিচার না করলে জীববিজ্ঞানের কোন শাখাই আর পুর্নাঙ্গতা লাভ করতে পারে না। আজকে পরিবেশ দূষণ বা গ্লোবাল ওয়ারমিং রোধে, গাছপালা, জংগল সংরক্ষণে, মাছ বা গৃহপালিত পশুর বংশবৃদ্ধিতে বিবর্তনবাদের জ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। বিবর্তনবাদের চর্চ্চা কিন্তু শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের শাখাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, আমাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িয়ে গেছে সে ওতপ্রোতভাবে। আমাদের নিজেদের ইতিহাসটা সঠিকভাবে বোঝার জন্য কিংবা ভবিষ্যতে আরও বহুদিন কিভাবে আমাদের প্রজাতিটিকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখা যায় তা জানার জন্য অর্থাৎ আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষৎকে বুঝতে হলে বিবর্তন তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি! আমাদেরকে উত্তর পেতে হবে হাজারো প্রশ্নের- বুঝতে হবে কখন কতগুলো প্রজাতির অস্তিত্ব ছিলো অতীতে, তারা কিভাবে নির্মুল হয়ে গেলো, কেনো ডাইনোসরগুলো হারিয়ে গেলো, কিন্তু টিকে গেলো ওই আরশোলাগুলো। জানতে হবে আমাদের মস্তিষ্কের আকার কখন হঠাৎ করে বড় হতে শুরু করেছিলো, ভাষার উৎপত্তি কখন কি করে হল, এর পিছনে মস্তিষ্কের বিবর্তন কি ভুমিকা পালন করেছিলো, আমাদের এই সভ্যতা সৃষ্টির পিছনে তাদের আবদানই বা কতটুকু? সমাজবিজ্ঞানীরাও আজকে বিবর্তনবাদের বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত ব্যভার ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে মিলিয়ে দেখতে শুরু করেছেন - আমরা কেন শুধু নিজের ছেলেমেয়ে বা আত্মীয় স্বজনের কথাই ভাবি, কখনও কখনও আবার নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ করি, কেনো বিভিন্ন প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে বাস করে, কেনই বা মানুষ ভালোবাসে, প্রেমে পড়ে, সংসারের গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয় - এর কতটুকু সামাজিক, সাংস্কৃতিক আব কতটুকুই বা জেনেটিকভাবে আমাদের দেহকোষেই লেখা রয়েছে তাও মিলিয়ে দেখবার সময় হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে তর্কের কোন সীমা পরিসীমা নেই, বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাবে ততই খোলাসা হয়ে উঠবে এর উত্তরগুলো। বিবর্তনবাদের আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার কথা না বলে আজকের লেখাটা বোধ হয় শেষ করা ঠিক হবে না, আমাদের আধুনিক সভ্যতার চেতনা এবং মননশীলতায় এর ভুমিকা অত্যন্ত গভীর। বিবর্তনবাদ আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে হাজার বছরের ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণাগুলো থেকে - নিজের সৃষ্টি রহস্যের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হতবিহ্বল মানব প্রজাতি এক সময় নিজেকে যে আদিম রূপকথা আর অপ্রাকৃত কল্পনার জালে আটকে ফেলেছিলো তা থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে ডারউইনের এই বিবর্তনবাদের তত্ত্বটিই। আশা করা যায় অচিরেই তার এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যাবে আমাদের এই ক্ষণজন্মা প্রজাতিটির উপর।

তথ্যসূত্র:

১. Evolution's Importance to society: An Interview with renowned scientist Massimo Pigliucci, 2005, www.actionbioscience.org/evolution/pigliucci/html

২. Myer E, 2001, What is Evolution, Basic Books, New York, USA. p 39

৩. World Health Organization, AIDs Epidemic Update:2005, Global Estimates For

Adults and Children:
http://www.unaids.org/epi/2005/doc/EPIupdate2005_pdf_en/Epi05_13_en.pdf

৪. Ridley M, 2004, Evolution, BlackwellPublishing, Oxford, UK.

৫. New Bird Flu Vaccine Might Not Work in Time, Discover, Special Issue, vol 27, no 1, January 2006. p 44

৬. Bug Battle Enters New Century, 2000, BBC Health News.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/590915.stm

৭. Infectious Disease and the Evolution of Virulence, PBS Website
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/01/6/text_pop/l_016_06.html

৮. Berra TM, 1990, Evolution and the Myth of Creationism. Stanford University Press, p 52

৯. Dobzhansky T, Pavlovsky O, Experimentally created incipient species of Drosophila, Nature. 1971 Apr 2;230(5292):289-92.

১০. Mosquin T, 1967. "Evidence for autopolyploidy in Epilobium angustifolium (Onaagraceae)", Evolution Vol. 21, pp713-719 ; Stanley, S., 1979; Macroevolution: Pattern and Process, SanFrancisco, W.H. Freeman and Company. p. 41; Mayr, E., 1970. Populations, Species, and Evolution, Massachusetts, Harvard University Press. p. 348; Bullini, L and Nascetti, G, 1991, Speciation by Hybridization in phasmids and other insects, Canadian Journal of Zoology, Vol. 68 (8), pp1747-1760; Nevo, E., 1991, Evolutionary Theory and process of active speciation and adaptive radiation in subterranean mole rats, spalax-ehrenbergi superspecies, in Israel, Evolutionary Biology, Volume 25, pp 1-125. etc.

১১. Collapse of Intelligent Design: Talk by Ken Miller, Professor of Biology, Brown University, http://www.mukto-mona.com

১২. Dr. Douglus J Futuyma (2005), Evolution, Sinauer Associates, INC, MA, USA

১৩. Tate J, Evolution of Polyploidy in Plants: http:// www.plaza.ufl.edu/jtate/

১৪. Single Gene Transforms Fish in One Genration, Discover, Special Issue, vol. 27, no.1, 2006. p 62

১৫. http://www.actionbioscience.org/evolution/irwin.html
and

Wake, DB and Yanev KP, 1986, Geographic variation in allozymes in a 'ring species,' the plethodontid salamander Ensatina eschscholtzii of western North America, Evolution, vol. 40, pp 702-715.

and

- Moritz C, Schneider CJ, and Wake DB, 1992, Evolutionary relationships within the Ensatina eschscholtzii complex confirm the ring species interpretation. Systematic Biology, vol 41, pp 273-291.

and

Wake, DB., and Schneider C J, 1998, Taxonomy of the plethodontid salamander genus Ensatina, Herpetologica vol. 54, pp 279-298.

১৬. Dawkins R, 2004, The Ancestors Tale, The Houghton Mifflin Company, Boston, NY, p 19.

১৭. Life Code of Chimps laid Bare, 2005, BBC News, http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4197844.stm

১৮. SEED, Year In Science 2005, Dec/Jan 2006. p 92

১৯. Initial sequence of the chimpanzeegenome and comparison with the human genome, 2005, Vol 437, doi:10.1038/nature04072.

২০. An Overview of Human Genome Project, 2006, National Human Genome Research Institute, http://www.genome.gov/12011238

পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির চতুর্থ অধ্যায়।}